Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ মার্চ, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১২ মার্চ, ২০১৮, সোমবার, ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৪

আগামী পুর নির্বাচনে স্বরূপবাবু কী থাকছেন না?

পুরসভার দায়সারা বাজেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৯ মার্চ : বর্ধমান পুরসভার পুরপতি ডাঃ স্বরূপ দত্ত কী আগামী পুর নির্বাচনে টিকিট পাচ্ছেন না? বর্ধমান পুরসভার সভাকক্ষে ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষের বর্ধমান পৌরসভার ঘাটতিশূন্য বাজেট বেশ করলেন পুরপতি ডাঃ স্বরূপ দত্ত। শুধু একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। কিন্তু নেই কোনো আয়-ব্যয়ের হিসাব। তবে আছে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। বিপুল পরিমাণ কর সরকারি সংস্থাগুলির কাছে বাকি থেকে গেছে। যার অর্ধেক আদায় করতে পারলে বর্ধমান শহরকে আরো সুন্দর করে সাজানো সম্ভব হতো। এই বিপুল অর্থ আদায় করারজন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাও জানাননি। শহরের মধ্যমণি কার্জন কেট তথা বিজয়তোরণের সৌন্দর্যায়ন করতে গিয়ে রাত্রে যে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সন্দেহ হয় হেরিটেজ স্মারকটির সৌন্দর্যের অবনমন ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়নি তো?

আগামী ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষের মোট বাজেট ২৯১ কোটি টাকা। বাজেট বৈঠকের পর সংবাদিক বৈঠকে পুরপতি ডাঃ স্বরূপ দত্ত জানান, হয়তো পরবর্তী নতুন পুরবোর্ডে তিনি নাও থাকতে পারেন। তাই এই নিয়ে জল্পনা, গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

যে সরকারি সংস্থাগুলি পৌরকর জমা দিচ্ছেন না। তাদের নাম ও অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ প্রকাশিত বাজেটের কপি থেকে উদ্ধৃত করা হল—

(১) ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, বি.এস.এন.এল—২৩,৬৩,২০০ টাকা। (২) সুপারিনটেন্ডেন্ট অব বর্ধমান হসপিটাল—১,২৯,৭৩,৬৪৭ টাকা, (৩) প্রিন্সিপ্যাল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ—১,৪৩,৫৩,৩২৬ টাকা, (৪) এক্সিকিউটিভ অফিসার, বি.ডি.এ—১,২৬,৩৬,০০০ টাকা, (৫) এস্টেট অফিসার, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি—৯০, ৫২,১০০ টাকা, (৬) অফিসার-ইন-চার্জ, বর্ধমান ফায়ার সার্ভিস—২০,৫৯,৮৫৪ টাকা, (৭) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এস.বি.এস.টি.সি, বর্ধমান—১৩,০০,২০০ টাকা।

ত্রিপুরায় লেনিন মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : ত্রিপুরায় আর.এস.এস, বিজেপির ফ্যাসিবাদী হামলা ও লেনিনের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সামিল হলেন সিপিআই(এম) কর্মীদের পাশাপাশি বর্ধমানের সাধারণ মানুষও। এদিন প্রতিবাদসভায় বক্তারা বলেন, নির্বাচন পরবর্তী হামলার মধ্যে দিয়ে আর.এস.এস. এবং বিজেপি-র গণতন্ত্র বিরোধী ফ্যাসিবাদী চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। লেনিনের মূর্তি বুলডোজার দিয়ে উপড়ে ফেলা হলো, ভাঙা হয়েছে মার্কসের মূর্তি। এদিন প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা হয় বর্ধমান শহরের কার্জন গেটের কাছে। ফ্যাসিস্ত বিজেপি এবং আর.এস.এস-এর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সব মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ত্রিপুরাতে যে সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেন নজরুল ইসলাম। এছাড়া প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অধিক্রম সান্যাল সহ অনেকেই লেনিন মূর্তিতে মালা দেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ত্রিপুরায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী বি জে পি কর্মীরা লেনিনের মূর্তি ভাঙায় তীব্র ধিক্কার জানালেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রীরা। সংগঠনের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে পারুলিয়া বাজারে এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

—এরপর চারের পাতায়

অ্যালয় স্টিল বাঁচানোর দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ মার্চ : কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়-র কাছে অ্যালয় স্টিল বাঁচানোর জন্য তার হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। একই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশেও পৃথক একটি স্মারকলিপি যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। অপরদিকে দুর্গাপুর (পূর্ব)-এর বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় একই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর ও মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়-র হস্তক্ষেপ চেয়ে দুটি পৃথক চিঠি বাবুল সুপ্রিয়-র হাতে তুলে দেন। এর আগে যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ও সি.আই.টি.ইউ-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী মন্ত্রীর কাছে দেশ গঠনের ক্ষেত্রে অ্যালয় স্টিল, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সহ দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রীয় শিল্প সংস্থাগুলির অপরিসীম অবদান ও অসীম সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন ও কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্য সেগুলি বন্ধ অথবা বিক্রি হয়ে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলে ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হতে চলেছে মন্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিক্রি হলে, প্রথমেই বিপদে পড়বে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও পরে সমগ্র দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল। দুর্গাপুর (পূর্ব)-এর সিপিআই(এম)

—এরপর চারের পাতায়

স্পন্দনে লেনিন আজও

দিনেশ ঝা

লেনিন মানে স্বপ্ন দেখা
লেনিন মানে স্বাধীনতার ভালবাসা,
লেনিন মানে অভিব্যক্তি
লেনিন মানে মুক্তির দিশা।
লেনিন মানে ক্ষুধাকে পরাস্ত করা
লেনিন মানে সম্পদের সমান বটওয়ারা,
লেনিন মানে রুজি-রুটি
শান্তি ও মৈত্রী।
লেনিন মানে এগিয়ে চলা
এক নতুন দুনিয়ার খোঁজে।

খবর এসে ছিল আগে
লেনিন এবার বাঁচবে না
বোধহয় তার পাকাগুটি
এবার আর কাঁচবে না।
কুষ্ঠি কেহ দেখছো তার?
নাই তাহাতে মৃত্যুযোগ
এ সপ্তাহে খবর এল
লেনিন এখন মুক্ত রোগ।

দাদাঠাকুর
জঙ্গীপুর বার্তা—
১৯১৮
ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম ছড়া।

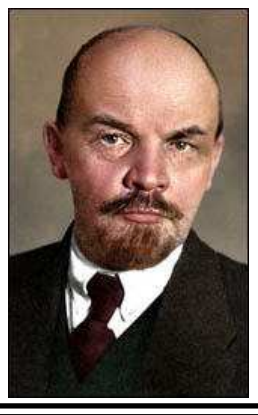

লেনিনের মৃত্যু হয়েছে ১৯২৪-এ। কিন্তু লেনিন মরলেন ২০১৮, ত্রিপুরায়। মূর্তি ভাঙার রাজনীতি আর স্বৈরতন্ত্রী শাসকের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে কয়েক লক্ষ লেনিন হাঁটছেন মহারাষ্ট্রে। আজ তাঁরা প্রবেশ করবেন ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে। সারা ভারত কৃষক সভার ডাকে নাসিক থেকে পাঁচদিন ধরে হেঁটেছেন তাঁরা। মুম্বাই প্রতীক্ষা করছে এক বেনজির অভিজ্ঞতার। লেনিনের মৃত্যুর পরে বাংলাদেশের এক অখ্যাত কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ব্যথিত হৃদয়ে লেনিনের স্মৃতিদর্পণ করেছিলেন এইভাবে—

"বারম্বার মৃত্যুর বার্তা রটায়েছে 'বিশ্বদূত'
হয়নি সে কাল
এইবার মরেছে লেনিন।"

আর আমাদের কিশোর কবি সুকান্ত লিখেছেন—

'লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লবের স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।"

১২ মার্চ বিশ্ব গ্লকোমা দিবস

আব্দুল করিম

আমাদের শরীরে যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে চোখ, কান, জিভ, নাক এবং ত্বক (চামড়া) এদের নিজ নিজ কাজ বা দায়িত্ব আছে। এদের মধ্যে চোখকে বলা হয় মহারত্ন। দৃষ্টিশক্তি হারালে কান দিয়ে শোনা, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেওয়া, জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ বা ত্বক দ্বারা উপলব্ধি সবই যেন বৃথা মনে হবে।

এই চোখ নিয়ে মানুষের ভাবনা অনেক কম, উদাসীন বললে ভুল হবে না! সচেতনতার অভাবে চোখে নানা রোগের কারণে মানুষ অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যায়।

বিশ্ব গ্লকোমা অ্যাসোসিয়েশন এবং বিশ্ব গ্লকোমা পেসেন্ট অ্যাসোসিয়েশন মিলিতভাবে চোখের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে ২০০৮ সালের ১২ মার্চ দিনটিকে বিশ্ব গ্লকোমা দিবস হিসাবে পালন করে। ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ১১ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ হিসাবে পালনের আহ্বান জানানয়।

চক্ষু চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন আমাদের চোখের অংশগুলিকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা অক্ষিগোলক, রক্ষণাত্মক অংশ, চক্ষু পেশী এবং অশ্রুগ্রন্থি। এই প্রতিটি অংশের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে আছে, আবার প্রত্যেকের কাজের মধ্যে সমন্বয়ও আছে।

অক্ষিগোলকের মধ্যেকার জলীয় পদার্থ নির্গত হতে না পারলে ভিতরে চাপ সৃষ্টি হয়, তা থেকে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে গ্লকোমা বলে।

অক্ষিগোলকের মধ্যেকার লেনসের সম্মুখভাগে অবস্থিত অ্যাকুমাস হিউমর নামে যে জলীয় পদার্থ থাকে এবং যা দর্শনেন্দ্রিয়ের রক্তচাপ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ করে। এই জলীয় পদার্থের স্বাভাবিক কাজে যখন কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি হয় তখনই এর রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং গ্লকোমা রোগের উৎপত্তি ঘটে।

সাধারণত দুধরনের গ্লকোমা রোগ দেখা যায়—(১) জন্মগত, (২) অর্জিত। বিভিন্ন ভেজাল তেল, ভেজাল খাদ্য থেকে এই রোগ হতে পারে। হতে পারে আঘাতজনিত কারণেও পৃথিবীতে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ অন্ধত্বের শিকার হয় তিনটি কারণে—প্রথমত, ছানিপড়া, দ্বিতীয়ত সংক্রমণ এবং তৃতীয় কারণ গ্লকোমা।

আমাদের এশিয়া মহাদেশে হাজারে একজন মানুষ গ্লকোমায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লকোমার প্রবণতা বেশি। ডায়াবেটিসকে যেহেতু আধুনিক জীবনচর্চাজনিত রোগ বলা হয়—তাই এক্ষেত্র থকে অদ্ভুত গ্লকোমা রোগকেও আধুনিক জীবনচর্চাজনিত গ্লকোমা বলা হয়।

একটি তথ্য থেকে জানা যায় ২০০৪ সালে চোখের রোগীদের মধ্যে মাত্র ০.৪ শতাংশ ছিল গ্লকোমা সম্পর্কে সচেতন, ২০১০ সালে সেই সচেতনতা বেড়ে হয় ৪১ শতাংশ। এখনতো বেড়ে দাঁড়িয়ে ৬৫ শতাংশ। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১২ মার্চ, ২০১৮

নারী দিবসের ভাবনা

নারীকে 'অর্ধেক আকাশ' বলে যতই বাক-বিভূতির আশ্রয় নেওয়া হোক না কেন, কার্যত তা সেই অর্ধেক আকাশের উপর বাকি অর্ধেকের, অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের, আধিপত্যেরই তাত্ত্বিক আবরণ মাত্র। বাস্তব কোন সত্যকে তুলে ধরে? প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার নারী-নিপীড়ন ও নির্যাতনের যে সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তাতে এই অত্যাধুনিক কালেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের এই নির্মম পদদলনে কি লজ্জায় অধোবদন হতে হয় না? প্রতি বছর নারী-দিবস পালন কি পুরুষতন্ত্রের আত্মস্থালনের একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র? প্রকৃত তথ্য তো সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

'ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম' তার ২০১৭ সালের রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী এই লিঙ্গ-বৈষম্যের যে সূচক প্রকাশ করেছে, তা সত্যিই উদ্বেগের কারণ। সূচকের মান ১ হলে তা নারী-পুরুষের সাম্যকে নির্দেশ করে, অসাম্য থাকলে মান হবে ১-এর কম, আর ০ হলে চূড়ান্ত বৈষম্য। অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর রাজনৈতিক ক্ষমতার নিরিখে ১৪৪টি দেশের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই বৈষম্যের মান ০.৬৮। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ৩২ শতাংশ অসাম্য দূর করতে পারলে তবেই লিঙ্গ-সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। সূচকে এগিয়ে রয়েছে আইসল্যান্ড, নরওয়ে। ০.৬৬৯ সূচক নিয়ে ভারত রয়েছে ১০৮ নম্বরে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমৃদ্ধ দেশের স্থানও ৪৯ নম্বরে। ৪৭ নম্বরে থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশই। ভারতকে তো অধোবদন হতেই হয়। বর্তমান ভারতের শাসক দল হিন্দু অতীতের অন্ধ পূজারী। তাই শাসনের তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতিতে পরিস্থিতির উন্নয়ন নয়, অবনমনই একমাত্র সম্ভাবনা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতেও অদূর ভবিষ্যতে এই লিঙ্গ-বৈষম্য দূর হবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। আজকের গতি-প্রকৃতিতে ১০০ বছর পরে লিঙ্গ-বৈষম্য দূর হতে পারে বিশ্বের ১০৬টি দেশে। কিন্তু তার জন্য নারীকে পুরুষের করুণার উপর নির্ভর করলে চলবে না। লড়াইয়ের মাধ্যমেই নারীকে আপন ভাগ্য জয় করতে হবে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষকেও এগিয়ে আসতে হবে এই লড়াইয়ে সঙ্গ দেবার জন্য। কেননা প্রকৃত লিঙ্গ-সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সমাজই প্রকৃত ভারসাম্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে না, আদর্শ সমাজ হয়ে উঠতে পারবে না।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : আজ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০,১৮২। তার মধ্যে ছাত্র ২২,১৩৬, ছাত্রী ২৮,০৪৬, সিসি ছাত্র আছেন ৬১৯ জন, ছাত্রী ২২৫৬ জন। কম্পার্টমেন্টাল ছাত্র ১৮৩, ছাত্রী ৪১৬। গতবারের থেকে জেলায় ৫১৯ জন পরীক্ষার্থী এবার বেশি।

৮৭৮টি প্রধান কেন্দ্র ও ৪৪টি উপকেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ১৩১ জন। কন্ট্রোল রুমের ফোন নং : ০৩৩-২৩৫৯২২৭৭/৭৮

লিঙ্ক ফেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গলসী ও আদরাহাটি পোস্টঅফিসে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে লিঙ্ক নেই। কোনো কাজ হচ্ছে না। মাসিক সুদ তুলে যাঁদের সংসার চলে তাঁরা পড়েছেন বিপদে। এজেন্টদের পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে গৌতম গাঙ্গুলী।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পৌরসভা কবে স্বীকৃতী লাভ করেছিল?
২. ভারতের প্রথম দুই মহিলা কে কে যাঁরা প্রথম স্নাতক হয়েছিলেন? কবে হন?
৩. সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী 'মস্কো' কবে হয়েছিল?
৪. সোভিয়েত রাশিয়ার রূপকারদের অন্যতম যোসেফ স্তালিন কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৫. ভেনেজুয়েলার অবিরাম যোদ্ধা, রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজ কবে প্রয়াত হন?
৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল?
৭. প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'শঙ্কু মহারাজ' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তাঁর কবে জন্ম?
৮. নিউ ইয়র্কের নারী শ্রমিকরা প্রথম সমহারে মজুরি ও কাজের সময়ের দাবিতে ধর্মঘট করেছিলেন?
৯. সারা পৃথিবীতে কবে থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু হয়েছিল?
১০. '৮ই মার্চ নারী বর্ষ' এই স্বীকৃতি ভারত সরকার কবে ঘোষণা করে?
১১. ইয়ার ইন্ডিয়া কবে নারীদিবসকে স্বীকৃতি দিয়ে কেবলমাত্র নারী পাইলট দিয়ে বিমান চালিয়েছিল?
১২. কোন বছর নারী দিবসে কোন নারী চলচ্চিত্র পরিচালক অস্কার পান? কোন ছবির জন্য? এই ছবি কটা অস্কার পেয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস : ফিরে দেখা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে ও সিদ্ধান্তে মানুষের বাঁচার ও জীবন-উন্নয়নের দাবিকে সামনে রেখে বিভিন্ন দিবস ও বিভিন্ন সপ্তাহ, এমনকি দশকও পালিত হয়। কিন্তু বিশ্বের অর্ধ-আকাশের 'নারী-দিবস' পালন একটি ভিন্নধর্মী, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের-আন্দোলনের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন—আজ যা নারী মুক্তি আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমান অধিকার অর্জনের সংগ্রাম দিয়ে ও মাদাম গুৎজের শহিদের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে যার শুরু নারী মুক্তি আন্দোলনের তার পরিণতি। 'সমান-অধিকার'-এর দাবি সেদিন পুরুষ শাসিত সমাজ মানতে পারেনি।

এক দীর্ঘ ইতিহাস। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর বাণী—নারীদের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৭৯৩ সালে 'মানব অধিকার' ঘোষণাপত্র রচিত হবার সময় ফরাসি নারী মাদাম গুৎজ বলেছিলেন, 'নারীদের যদি ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দেবার অধিকার থাকে, তবে পার্লামেন্টেই বা অধিকার থাকবে না কেন? সেই বৎসরই এই মহান সংগ্রামী নারীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়। প্রথম আন্তর্জাতিকে কার্ল মার্কস-এর কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার-এর প্রশ্নটিকে উত্থাপন করা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম আন্তর্জাতিকে নারীর কাজের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৮৯ সালে বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম-সম্মেলনে 'নারী-পুরুষের সমানাধিকার'-এর দাবি তুলে ধরেন। তখন এই আন্দোলনগুলি ছিল মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাকষা।

নিউইয়র্কের নারী দর্জি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও দশঘন্টা কাজের দাবিতে সংগ্রাম (১৮৫৭ মার্চ), ১৯০৮ সালে ৮ মার্চ শুরু দর্জি মেয়েদের 'ভোটাধিকার দাবি'র আন্দোলনে রূপান্তির হয়। তিন বছর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেন-হেগেন-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ১৭টি দেশের ১০০ জন প্রতিনিধিদের প্রস্তাবক্রমে প্রতি বছর একদিন পূর্ণবয়স্কা নারীদের 'ভোটাধিকার দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তখন ভোটাধিকারের আন্দোলনই ছিল নারীদের প্রধান আন্দোলন। ১৯১১ সালে ১১ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। নারী দর্জিশ্রমিকদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে স্মরণ করেই '৮ মার্চ সমানাধিকার সংগ্রামের প্রতীক দিবস' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ক্ষুধা, বেকারী, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সংগ্রাম আজও চলছে নারীমুক্তির সংগ্রাম-মানবমুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। লেনিনের ভাষায়, "যতক্ষণ না শোষিত নারীজাতির জন্য পূর্ণমুক্তি আনতে না পারে, ততক্ষণ সর্বহারা পূর্ণমুক্তি পেতে পারে না।"

আজকের দিনটি হচ্ছে সালতামামির দিন। নতুন করে কাজের পরিকল্পনা নেওয়া ও শপথ গ্রহণের দিন। নারীর অগ্রগতি হয়নি—একথা বলা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী পদে নারী, জেট বিমান চালনায় নারী, যুদ্ধবিমান চালাচ্ছে নারী, শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটেছে নারীর। হারও বেড়েছে নারীশিক্ষার, অনেক উন্নতি ঘটেছে নারী-স্বাস্থ্যের, পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাঁদের আকাশে ওড়াচ্ছে সরকাব। রেলগাড়িতে সব মহিলা টিটিই—ব্যবসাদারগণ আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে—নয়া নয়া চোখ ধাঁধানো উপহার। অনলাইনে কেনাকাটা, গ্রামেও দেখি অনলাইনের পোষাক পরে আছে গরিব ঘরের কিছু ছেলে মেয়ে। বিবাহ এখন লিভটুগেদারে ঠেকেছে—অন লাইনে বিয়ে—চারদিকে স্বাধীনতার হাওয়া—গোলমালটা কোথায়?

এই ঝাঁচকচকে সমাজে যে প্রশ্নটি উঠে আসে—'নারী কি আজ সত্যই প্রথম শ্রেণির নাগরিক'? সরকার কি তাই মনে করেন? আজ থেকে ১০৪ বছর আগে ১৯১৪ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তোলা দাবিগুলির আজও কি সমাধান হয়েছে—একটিই স্পষ্ট উত্তর—না। দাবিগুলি ছিল—ক্ষুধা, বেকারি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ সমানাধিকারের দাবি মেনে নিলেও প্রকৃতপক্ষে আজও সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা যায় না।

পুরানো দাবিগুলির দিকে একবার তাকাই? ২০১৫ সালের ইউ.এন. রিপোর্টে দেখা যায় ২০১৪-১৫ সালে ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষ ছিল ১৯৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ—বিশ্বে অর্ধবৃহৎ ক্ষুধার দেশ। ২০১৬-তে গ্লোবাল ক্ষুধার ইনডেক্সে (জি এইচ আই) ভারতের স্থান ৯৩। চিন ২৯, নেপাল ৭২, শ্রীলঙ্কা ৮৪। ১১৮টি দেশের মধ্যে প্রতিদিন ক্ষুধার কারণ মারা যায় ৭০০০ মানুষ। অর্ধেক মহিলা সে যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। কবির ভাষায়—'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'।

মহিলাদের শরীর-স্বাস্থ্য কেমন? অপুষ্টি ভারতের ভয়ানক সমস্যা (গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট, ২০১৭)। নারীর অর্ধেক সংখ্যা ৫১ শতাংশ গর্ভবতী অবস্থায় রক্তশূন্যতায় ভুগছে। সুস্থ-সবল নাগরিকের জন্ম হবে কি? পুষ্টির অভাবে ৫ বছরের নীচের বাচ্চাদের ৩৮ শতাংশ বয়সের অনুসারে কম-উচ্চতার রোগে ভুগছে—মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটছে না। সুনাগরিক জন্ম নেবে?

স্বাধীনতার পরে ভারতের নারী-আন্দোলন গতিলাভ করে। নারী তার বিভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় নারীদের সমতার স্বীকৃতি (১৫/১ ধারা), সুযোগের সমতা (১৬ ধারা), সমকাজে সমবেতন (৩৯ ডি ধারা), নারীর মর্যাদা বিরোধী যে-কোনো কাজ (৫১(এ)(ই)ধারা) প্রভৃতি স্বীকৃত। কিন্তু আজও সংসদে আসনের এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়নি—দাবিগুলিও পূরণ হয়নি।

কিন্তু প্রয়োগে রয়েছে শৈথিল্য, যা অনীহা, না পুরুষ শাসিত সমাজের প্রভাব? একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে মনে হয় : ইন্টার ন্যাশানাল সেন্টার ফর রিসার্চ অব ওয়োমেন (২০১১) এবং ইন্টারন্যাশনাল মেন অ্যান্ড জেনডার ইকোয়ালিটি সার্ভে (ইমেজ) থেকে জানা যায় যে ৬৫ শতাংশ ভারতীয় পুরুষ বিশ্বাস করে যে পরিবারকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার জন্য নারীদের অত্যাচার সহ্য করা উচিত এবং মাঝে মাঝে উত্তম-মধ্যম (মার)-এরও প্রয়োজন। ২০১১-র জানুয়ারির 'ইমেজ'-এর সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ২৪ ভাগ ভারতীয় পুরুষ যৌন-আক্রমণে যুক্ত।

এরই মধ্যে মোদিজির হাত ধরে আর.এস.এস.-এর আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে ঘরওয়াপসি, নারীদের ৪টি/৫টি এমনকি দশটি সন্তান জন্ম দেবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিজেপি সাংসদ/নেতাদের পক্ষ থেকে। এমনকি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বেশি বিবাহের পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। নারীদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মনুবাদের যুগে—গর্তের অন্ধকারে।

স্বাধীনতার প্রায় ৬৯ বছর পরেও ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্য থেকে নারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বিশ্বে মাথা নত করে দেয়। ভারতে প্রতি তিন মিনিট অন্তর নির্যাতিতা হচ্ছে একটি নারী। প্রতি ২৯ মিনিট অন্তর ধর্ষিতা হচ্ছে একজন নারী—শিশু, যুবতী, বধূ ও বৃদ্ধা কারোরই রেহাই নেই। প্রতি ৯ মিনিট অন্তর একজন নারী তার স্বামী/নিকট আত্মীয়ের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। ভারতে নারীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৭.৫ শতাংশ, কিন্তু এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের হার ১২.৭ শতাংশ—সব রাজ্যগুলির থেকে বেশি। ভ্রূণ হত্যা আজ মহামারীর রূপ নিয়েছে। বেটি বাঁচবে কী করে? তাই কিছু গবেষকের মতে ভারতে মহিলারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক—বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও-এর দামামা টিভি, রেডিও, কাগজে, নেটে সরকারি প্রচারযন্ত্রে চলছে—কিন্তু সরকারের কানে ঢোকে না—সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তো ঢুকবে? মোদিজি এখন সর্বক্ষেত্রেই ধ্যানমগ্ন ও দিদিজি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। সবই ছোট ঘটনা। খাপ পঞ্চায়েত এখন বেপরোয়া—বেটিরা যাবে কোথায়? বাঁচবে কী করে?

শোষণ-ভিত্তিক সমাজ—ভারতের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রগত পরিবর্তন না ঘটিয়ে মহিলা নারী সহ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা কি সম্ভব? তাই আজ প্রয়োজন পুরুষ-মহিলাদের একসাথে নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকারগুলি নারীদের দাবিগুলি সহ সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা ও শ্রমজীবী মহিলা পুরুষসহ ব্যাপক মানুষকে রাস্তায় নামানো ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সৃষ্টি করা—এবারে লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে—আগামী বছরে মাদাম গুৎজের মতো ফাঁসি হবে আন্দোলনকারীদের : কারণ ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি নয়, আক্রমণ লক্ষ করা যাচ্ছে। জার্মানির ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের একটি ঘটনা দিয়েই শেষ করি। জার্মানিতে হিটলার আক্রমণ করছে কমিউনিস্টদের— কবি ভাবছেন, আমার কী, আমিতো কমিউনিস্ট নই। এবার সোস্যালিস্টদের উপর আক্রমণ—কবির ভাবনা আমার কী। তারপর শ্রমিকদের উপর আক্রমণ—কৃষকদের উপর আক্রমণ—কবির সেই একই ভাবনা—আমার কী! এর পর স্বয়ং কবির ওপর আক্রমণ। কবির পাশে আর কেউ নেই—শুধু যম—হিটলারবাহিনী।

রাতে বাড়ি ফেরার পথে খুন স্বর্ণ ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, ৯ মার্চ : দোকান বন্ধ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে খুন হলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মৃত ব্যবসায়ীর নাম রমেশ বিশ্বাস (৪৯)। মেমারি থানার দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের অধীন সিমলা পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ক্যানেলের পাড় থেকে ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ ব্যবসায়ীর বুকে ঘাড়ে ও ডান হাতে গভীর ক্ষত ছিল। পরিবারের দাবি ডানহাতের কব্জির শিরা কেটে দিয়ে, বুকে ধারালো অস্ত্রের কোপ বসিয়ে দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে থাকা গহনার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মেমারির কেন্না ঘোষ পাড়ায় ব্যবসায়ীর সোনার দোকান। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার মধ্যে দোকান বন্ধ করে রাত ৮টার মধ্যে বাড়ি ফেরেন, এদিন তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকেরা বারবার ফোন করেও কোন যোগাযোগ করতে পারেন নি। প্রতিবেশী ও পরিবারের সকলে খোঁজখবর শুরু করলে দেখা যায় দোকানও বন্ধ। পাশাপাশি দোকানদাররা জানান তিনি অন্যান্য দিনের মতো ঠিক সময়েই দোকানবন্ধ করে বাড়ির পথে রওনা হতে দেখেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিমলা গ্রামের সেচ খালের পাড়ে তাঁর দেহ পাওয়া যায়।

নারীদের আলোকপ্রাপ্তির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন শৈলবালা ঘোষজায়া এবং সুলেখা সান্যাল

নারী দিবসে বর্ধমানের মহিয়সী মানবী—**শৈলবালা ঘোষজায়া** এবং **সুলেখা সান্যাল**-কে নিয়ে লিখেছেন

শ্যামসুন্দর বেরা

শৈলবালা ঘোষজায়া

বাংলা সাহিত্যে পুরুষপ্রাধান্যের যুগে প্রথম উল্লেখযোগ্য নারী-সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত হন স্বর্ণকুমারী দেবী। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নামগুলি জ্যোতির্ময়ী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সাবিত্রী রায়, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ। জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং শৈলবালা ঘোষজায়া জন্মেছিলেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে—প্রথম জন ২৩ জানুয়ারি জয়পুরে এবং শেষোক্ত শৈলবালার জন্ম ২ মার্চ (১৯ ফাল্গুন, ১৩০০) চট্টগ্রামের কক্সবাজারে।

প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু' (তৃতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত হয়ে 'শেখ আন্দু') তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসেবে পরিচিতি এনে দেয় শৈলবালা ঘোষজায়াকে। ১৩২১ সালে রাতজেগে লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি স্বামীর হাত দিয়ে 'প্রবাসী'-র দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন তিনি। ১৩২২-এর বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত এগারোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের নায়িকা হিন্দু মনিবকন্যা এবং নায়ক তাদের মুসলমান ড্রাইভার। সে-সময়ের প্রেক্ষিতে একজন রক্ষণশীল পরিবারের বধূ বা লেখিকার পক্ষে উপন্যাসটি ছিল একটি দুঃসাহসিক রচনা। শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় 'চতুরঙ্গ' (বর্ষা, ১৪০০) পত্রিকায় 'শৈলবালা ঘোষজায়া ও শেখ আন্দু' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন—"...যে উদার সংস্কারমুক্ত মানবিক চেতনা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূত্রে শিক্ষিত হিন্দুমনে সাময়িকভাবে হলেও স্বাস্থ্যকর প্রভাব ফেলেছিল তার ক্ষীয়মাণ বিভা গোঁড়া হিন্দু ঘরের বউ হওয়া সত্ত্বেও শৈলবালার মনকে আলোকিত করেছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনও যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সে যুগের বিখ্যাত সম্পাদক এবং ব্রাহ্ম আদর্শবাদী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে নিতান্ত অপরিচিতা এই তরুণীর সাহসী প্রথম উপন্যাসটিকে তাঁর প্রভাবশালী মাসিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে সন্দেহ থাকে না যে শৈলবালার সংস্কারমুক্ত প্রতিন্যাস তাঁর উদারপন্থী বিচারে মূল্যবান এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়েছিল।"

বৈশাখ সংখ্যায় লেখিকার নাম ছাপা হয়েছিল শৈলবালা ঘোষ। পরের সংখ্যা থেকেই পদবি বদলে হয় 'ঘোষজায়া'। 'ঘোষজায়া' কেন? এই কৌতূহল নিরসন করেছিলেন অনেককাল পরে সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে। শৈলবালার কথায়—"আমি নামের পর ঘোষজায়া কেন লিখি জান? শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে, আমিই ওদের নতুন বউ শৈলবালা ঘোষ। ওসব লেখাটেখার ওরা ধার ধারত না, খবরও রাখত না।" শ্বশুরবাড়িতে তাঁর অবস্থা হয়েছিল অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পের উমার মতো। দরজা বন্ধ করে বউদিদি কী করে তা আবিষ্কার করতে তিন ননদ তিলকমঞ্জরী-কনকমঞ্জরী-অনঙ্গমঞ্জরী দরজার ফুটো দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে বুঝেছিল বউদিদি লিখছে। শৈলবালার সাহিত্যসৃষ্টির কথা আবিষ্কৃত হয়নি। শ্বশুরবাড়ির কিছু মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে স্বামী উন্মাদ তাই ঘরের বউ পুরোনো প্রেমিককে প্রেমপত্র লেখে!

বর্তমান সময়ে প্রায় বিস্মৃত বা অনালোকিত শৈলবালা ঘোষজায়া। বিবাহ সূত্রে তিনি ঘোষ হয়েছিলেন। বাবা ছিলেন শল্যচিকিৎসক কুঞ্জবিহারী নন্দী। মা হেমাঙ্গিনী দেবী ছিলেন ঋষি অরবিন্দের সম্পর্কিত বোন। চট্টগ্রামের বাস উঠিয়ে ১৮৯৮-এ আসেন বর্ধমানের সরাইটিকরে। শৈলবালার শৈশব কেটেছে কিন্তু বর্ধমান রাজবাড়ির উল্টো দিকে পায়রাখানা লেন-এ। পড়াশোনা সে-সময়ে শুলিপুকুরের পূর্ব কোণে 'রাজবালিকা বিদ্যালয়'-এ। স্থান এবং নাম পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে স্কুলটি পরিচিত হয় মহারানি অধিরানি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে।

তেরো বছর বয়সে শৈলবালার বিয়ে হয়ে যায় মেমারির নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে। একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত কাজ করে রাতে লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া চালিয়ে যেতেন। আঠারো বছর বয়সে প্রথম গল্প 'বীণার সমাধি'। তারপর কুড়ি বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু'। নরেন্দ্রমোহন কিছুকাল কলকাতায় গিয়ে হোমিওপ্যাথি পড়েন এবং টাইপ-শর্টহ্যান্ড শেখেন। শৈলবালা সেই খরচ যুগিয়েছিলেন লিখে রোজগার করে। শৈলবালার ছাব্বিশ বছর বয়সে স্বামী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। স্বামী এবং পরিবারের মানুষের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁর দাদা অশ্বিনীকুমার তাঁকে বর্ধমানে নিয়ে চলে আসেন। মাঝে মাঝে অবশ্য স্বামীকে দেখতে যেতেন। ১৯২৬-এ শাশুড়ি প্রয়াত হলে আবার শ্বশুরবাড়ি আসেন। স্বামী প্রয়াত হন ঠিক তার তিন বছর পর ১৯২৯-এ অর্থাৎ শৈলবালা তখন মাত্র ছত্রিশ! সন্তানহীনা শৈলবালার একমাত্র অবলম্বন হয় পড়াশোনা আর লেখালেখি। মেমারিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় মহিলাদের আলোকপ্রাপ্তিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে প্রাতঃবিভাগে নারীশিক্ষার আয়োজন করেন। সঙ্গে পেয়েছিলেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষজনকে। তাঁর প্রচেষ্টায় তৈরি রসিকলাল বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে পূর্বোক্ত শাখাটি মিশে যায়। ১৯৫০ নাগাদ পড়িয়েওছেন রসিকলাল স্কুলে। নানা কারণে ১৯৫৩-য় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরে বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে।

নিরাপত্তাহীনতা, পারিপার্শ্বিক কিছু পরিজনের আচরণে তৈরি হওয়া অবিশ্বাস চিরকাল তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছিল। ছুটে বেড়িয়েছিলেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে। ১৯৬৯ সালে নাগাদ ভাসুরপো ডা. পরিমল ঘোষ 'নতুন মা' শৈলবালাকে নিজের বাড়িতে আনার পরিকল্পনা করেন। হটন রোড এবং এস.বি. গড়াই রোডের সংযোগস্থল ইসমাইল মোড়ের 'সত্যনারায়ণ' বাড়ির ভরাট সংসারে একজন অসহায় পরমাত্মীয়াকে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি কেউই। বর্তমান গৃহকর্ত্রী ভারতী দেবী তখন একুশ বছরের নববধূ। শৈলবালার অপত্যস্নেহে সিক্ত হয়েছেন নাতি শ্যামসুন্দর এবং নাতবৌ ভারতী দেবী। শেষ অবলম্বন হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁদের কন্যা দেববর্ণা (মুনমুনকে)। 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত শৈলবালার শেষ লেখা 'তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কলব!' এই মুনমুনের প্রতি বাৎসল্যকে কেন্দ্র করেই। ২১ নভেম্বর ১৯৭৪ এই বাড়িতেই কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শৈলবালা ঘোষজায়া।

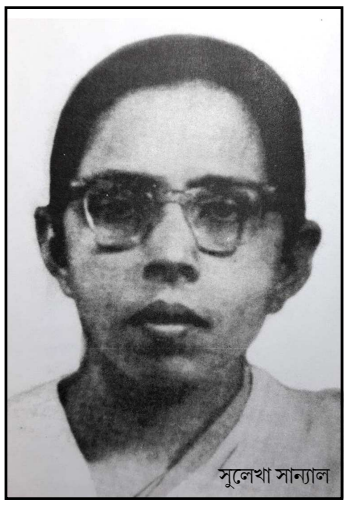

সুলেখা সান্যাল

সুলেখা সান্যাল

শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তি তাঁর কাছে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি অনিবার্যভাবে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিস্রোতের প্রতীক। তিনি সুলেখা সান্যাল। তাঁর জন্ম ফরিদপুরের কোড়কদি বা কুসুমডিহি গ্রামে। পারিবারিক ইতিহাস অনুসারে জানা যায় উনিশ শতকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সান্যালরা ছিলেন ধনাঢ্য ভূস্বামী। প্রথমে ছিলেন ভূমি-রাজস্ব সংগ্রাহক এবং পরে জমিদারি পত্তন করেছিলেন। ধীরে ধীরে তা ক্ষীয়মান হয়ে যায়।

অপূর্বকুমার এবং সরযূবালার কৃতী পাঁচ সন্তানের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক অবন্তীকুমার সান্যাল। দ্বিতীয় জন শিল্পী অজিত সান্যাল এবং আর এক ভাই সুজিত সান্যাল। দুই বোন সুলেখা-সুজাতার মধ্যে সুলেখা সান্যালের জন্ম ১৯২৮-এর ১৫ জুন। মা ছিলেন উনিশ শতকের অন্যতম সমাজ সংস্কারক রামতনু লাহিড়ীর দৌহিত্র পরিবারের মেয়ে। হিন্দু এবং ব্রাহ্ম বিশ্বাসের মিশ্র উত্তরাধিকার ছিল তাঁর। মন ও মননের ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের তুলনায় আধুনিক ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে আর মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাবে—সান্যাল পরিবারের তখন পর্যন্ত প্রচলিত এই রীতির উল্টো স্রোতে হেঁটেছিলেন সরযূবালা।

পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বময়ী মায়ের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন সুলেখা সান্যাল তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে। 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসে ছবির মা এবং 'দেওয়ালপদ্ম' উপন্যাসের সঞ্জয়ের মায়ের মধ্যে সরযূবালার উপস্থিতির আঁচ পাওয়া যায়। 'নবাঙ্কুর'-এ ছবির ঠাকুমার কথা—"মেয়েকে একেবারে জজ ম্যাজিস্ট্রেট করবেন মায়ে। নয় পেরিয়ে দশে পড়বে, আর পাঠশালায় রাখতে দিলে তো কত্তা। বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি গেলে কোথায় যাবে লেখাপড়া? তখন হাঁড়ি ঠেলে, ছেলে মানুষ করেই কূল পাবে না। মেয়েমানুষের কপাল।" মানবীকে

—এরপর চারের পাতায়

নারী দিবস ও আমরা

শিবানী পাল

'মেয়েরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই জয় করতে পারবে। তাদের পরিশ্রম আর একাগ্রতা দিয়ে তারা একদিন এই সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। নিজেদের প্রমাণ করার জন্য তাদের পুরুষের সাহায্য প্রয়োজন হবে না।' বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব রূপায়ণের আর এক নাম ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস, যে দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজ অপরিসীম। কারণ এই দিনটিতেই শুরু হয়েছিল শ্রমজীবী নারীর কাজের সময় নির্ধারণের, ছুটির এবং সম্মানজনক পারিশ্রমিকের দাবিতে আন্দোলন। একজন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক লিখেছেন- 'Men build house and women establish home'-এই কথাটিই আর একটু অন্যভাবে লিখলেন সাম্যবাদের পূজারী নজরুল—

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

মনীষীদের এই কথাগুলিই বুঝিয়ে দেয় নারী-পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে আছে সমাজব্যবস্থা।

৮ মার্চের ইতিহাস সার্ধ-শতাধিক বছরের প্রাচীন। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার পোষাক তৈরির কারখানার কর্মরতা নারী শ্রমিকেরা কাজের সময় এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নতির দাবিতে ধর্মঘট করে। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের হাজার হাজার মহিলা শ্রমিক ভোটাধিকারের দাবিতে মিছিল করে। ১৯১০ সালের ২৭ আগস্ট জার্মানির কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে সমাজতান্ত্রিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং দরজি শ্রমিকদের আন্দোলনকে স্মরণে রেখে ৮ মার্চকেই সেই মহান দিন হিসেবে পালনের সূত্রপাত হয়। ১৯১১ সালে ইউরোপে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই মহৎ যজ্ঞে ক্লারা জেটকিনের সুযোগ্য সাথী ছিলেন রাশিয়ার বিখ্যাত লেখিকা আলেকজান্দ্রা কলোনটাই। এই দুই মহীয়সী মহিলা সর্বত্র এবং সর্বযুগের মহিলার নমস্য। তাঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়। আজ আর এই দিনটি কোনো ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নেই। সারা বিশ্বের স্বাধিকার বোধসম্পন্ন মহিলা এই দিনটিকে প্রতিবাদ ও স্মরণের দিন হিসাবে উদযাপন করে।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যত একসূত্রে গ্রথিত। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণে অতীতের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। তাই দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের মহিলাদের দ্বি-মুখী অবস্থান। একদিকে আর্যযুগে দেখছি গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপলাকে। আর অন্যদিকে এক পুরুষের বহু স্ত্রী। স্বামীর স্মৃতি বিভ্রমে স্ত্রীর বিড়ম্বনা। মুনি-ঋষিদের নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতে পরস্ত্রীকে ব্যবহার। স্বার্থের জন্য স্ত্রীকে বনবাসে নির্বাসন, মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য এক নারীকে পঞ্চ ভ্রাতার স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপনের অপমান, পরাজিত রাজার রানীকে বিজেতার ভোগ্যা হতে বাধ্য করা।

অথচ তারপরে একে একে এসেছেন সুলতানা রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, রানী রাসমণি, নিবেদিতা, লক্ষ্মী সায়গল, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা যোশী, ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিভা সিং পাতিল, কল্পনা চাওলা প্রমুখ ব্যক্তিত্বময়ী এবং স্বাধিকারবোধসম্পন্না নারী। বিদেশেও এঁদের সংখ্যা কম নয়—সিরিমাভো বন্দরনায়েক, মার্গারেট থ্যাচার, শেখ হাসিনা প্রমুখ দেখিয়েছেন নারীর কর্মক্ষেত্র কত বিস্তৃত।

কালের স্রোতে সভ্যতার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। হিন্দু সমাজের ঘৃণ্য সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য একদিন সোচ্চার হতে হয়েছে রাজা রামমোহনকে। বিদ্যাসাগরকে আজীবন আন্দোলন করে যেতে হয়েছে বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধের জন্য। এঁদের পাশে ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এই নিস্বার্থ পদক্ষেপকে বর্তমান নারীসমাজ সেলাম জানায়। কিন্তু আমাদের দেশে মুসলিম নারীসমাজ আজো তিন তালাকের গণ্ডী থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। হিন্দু মহিলাদেরই কি সার্বিক মুক্তি ঘটেছে? বর্তমানে কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে রাজ করছে আর এস এস মদতপুষ্ট ভারতীয় জনতা দল। দলপতি নরেন্দ্র মোদী মসনদে বসার আগে এবং পরে ভারতবাসীকে গালভরা আশ্বাস দিয়ে আসছেন—'আচ্ছে দিন আয়েগা', 'বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও'—যে শ্লোগান আজ হাস্যাস্পদে পরিণত হয়েছে। আজ তিন বছরের শিশুকন্যা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা গণ-ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। এমনকি সন্ন্যাসিনীও বাদ যাননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লালসা মিটিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে। আজ মহিলারা শিক্ষায়তনে-কর্মক্ষেত্রে পথে-ঘাটে সর্বত্র বিপন্ন। বি জে পি-র দর্শন অনুযায়ী মহিলারা কমপক্ষে চার সন্তানের জননী হবেন। সংসার পরিচালনা করাই হবে তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করা চলবে না। পিছনে আছে সদা সতর্ক খাপ পঞ্চায়েতের ক্রূর দৃষ্টি।

পশ্চিমবঙ্গে মা মাটি মানুষের রাজত্বেও নিরন্তর ঘটে চলেছে পার্কস্ট্রীট, কাটোয়া, কামদুনি, মধ্যমগ্রামের মত দুর্বিষহ ঘটনা। অথবা তথাকথিত শাসক দলের সাংসদের উক্তি—বাড়িতে গুণ্ডা ঢুকিয়ে বলাৎকার করিয়ে দেবার হুমকি। আবার এরাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সব ঘটনা কখনও ছোটো খাটো ভুল বা সামান্য ঘটনা। ছেলেমানুষের কাজ অথবা খরিদ্দার পাওনাদারের ব্যাপার। প্রতিবাদ জানাতে গেলে শুনতে হয়েছে প্রতিবাদীরা হয় মাওবাদী অথবা সি পি আই (এম)-এর ষড়যন্ত্র। একদিকে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করে বাহবা নিচ্ছেন অন্য দিকে ধর্ষণ বা খুনের আতঙ্কে সারা রাজ্যে কন্যারাই শ্রীহীনা হয়ে রাত কাটাচ্ছেন।

এইখানেই অবমাননার শেষ নয়—আজও মাতাপিতার কাছে শিশুপুত্র ও শিশুকন্যা সমান মর্যাদা পায় না। আজও ছাঁটাইয়ের প্রশ্নে যে নামটি প্রথম উঠে আসে সে একজন মহিলা কর্মী। পণ্য বিপণনের জন্য নারীর ব্যবহার আজও চলছে। এমনকি পুরুষের ব্যবহার্য পণ্যের ক্ষেত্রেও নারী শরীরেরই প্রয়োজন হচ্ছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরাই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। আসল কথা আমাদের বিরোধ পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। এ কথা বুঝতে হবে।

কন্যা ভ্রূণ হত্যা এবং শিশুকন্যা হত্যার ফলে নারীর সংখ্যা দিন প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের শিশুকন্যারাই আগামী প্রজন্মের সৃষ্টিকারীনি। স্রষ্টা যদি সর্বাঙ্গসুন্দর না হয় সৃষ্টিও নিখুঁত হবে না। তাই আমাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের অবজ্ঞা অবহেলা নির্যাতন থেকে তুলে ধরতে হবে। কিন্তু দেখা যায় না দেশের কেন্দ্রের সরকার না রাজ্যের সরকার কারো কোন হেলদোল নেই। বর্তমান বছরের বাজেটের ছবিটাও দেখা যাচ্ছে মহিলা স্বার্থবিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পক্ষপাতের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার দাবিতে, সর্বপ্রকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণায় বিশ্ব নারী দিবসের ভাবনা 'প্রেস ফর প্রগ্রেস'কে প্রতিষ্ঠিত করার শপথ নিতে হবে গণতন্ত্র প্রিয় মহিলাদের।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৮৬টি পরিবারের পাশে দাঁড়াল মহিলা সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান, ১০ মার্চ : সম্প্রতি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পূর্বস্থলীর ধরমপুর গ্রামে ৮৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই পরিবারের সদস্যদের হাতে ত্রাণ তুলে দিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দ। সমিতির পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির নেতৃত্বে এদিন এক প্রতিনিধি দল ধরমপুর গ্রামে পৌঁছান। গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় মোট ৮৬টি পরিবারের লোকজনদের হাতে জামা-কাপড়, সায়া-ব্লাউজ এবং ছেলেমেয়েদের পোশাক তুলে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দীপালি দাস, খুকু সাহা, অনিমা দাস, রূপা মণ্ডল, শেফালি সাহা ও বাসন্তী কুড়ি। এছাড়া প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক বিনকাসেম সেখ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে গত ৫মার্চ ধরমপুর গ্রামে একসাথে ২০টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় গোটা

গ্রামের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়। তিনশোটি তাঁতকলের যাবতীয় সরঞ্জাম পুড়ে যায়। কাপড়ের গাঁট পুড়েছে যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ঘরের যাবতীয় টাকাকড়ি সমেত জিনিসপত্রের সঙ্গে পুড়েছে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র। খবর পেয়ে ৬মার্চ স্থানীয় বিধায়ক সি পি আই (এম) প্রদীপ কুমার সাহা কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হন। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম) পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল ও বিনকাশিম সেখ, রনজিৎ মাহাত, রাজেন্দ্র ঘোষ, রতন ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য রহিত সেখ প্রমুখ।

—প্রথম পাতার পর

দেশের সাথে প্রতিবাদ বর্ধমানে

সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটি সম্পাদিকা আলেয়া বেগম। সংক্ষিপ্ত সভার পর ফ্লেক্স, ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে শুরু হয় মিছিল। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পূর্বস্থলী বাজারে শেষ হয় মিছিল।

মেমারিতে মিছিল বাজার পরিক্রমা করে বামুনপাড়া মোড়ে শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়িকা সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, অশোক যশ, আরতি গাঙ্গুলী, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ। বক্তারা বলেন, পশ্চিমবাংলায় ২০১১ সালের নির্বাচনের পর যে ঘটনা ঘটেছিল ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় নির্বাচনের ফল বেরুনোর পর হুবহু একই কায়দায় সি পি আই (এম) সহ বামপন্থী নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ, হামলা, পার্টি দপ্তর ভাঙ্গচুর, অগ্নিসংযোগ, লেনিন মূর্তি ভাঙা ইত্যাদি সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে প্রশাসন।

গুসকরায় অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ মিছিল। শিরীষতলা, ক্ষেত্রপাল তলা, হাটতলা, স্টেশন এলাকা প্রভৃতি জায়গায় পরিক্রমা করে। গুসকরা শহরের মানুষ মিছিলে অংশ নিয়ে প্রতিবাদ জানান। রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষ হাততুলে সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহ দেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টি নেতা নারায়ণ ঘোষ সহ গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ।

ত্রিপুরায় লেনিন ও মার্কসের মূর্তি ভাঙা এবং নির্বাচনের পরাজিত সিপিআই(এম) কর্মীদের উপর সন্ত্রাস নামিয়ে ঘরছাড়া করা, পার্টি অফিস বেদখল করার, পুড়িয়ে দেবার প্রতিবাদে গলসীতে প্রতিবাদ মিছিল বাজার পরিক্রমা করে আপবাসস্ট্যাণ্ডে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) গলসী ২নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক মতিয়ার রহমান, মুস্তাক হোসেন, শিশির কেশ ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। সভাপতিত্ব করেন নাড়ুগোপাল যশ। নারী দিবসে গলসী ১নং এরিয়া কমিটির পক্ষে বুদবুদ বাজারে প্রতিবাদ সভা হয়।

বর্ধমান শহরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নোটবন্দীতে মানুষ নাজেহাল হয়েছিল। গরিব মানুষকে যতরকম ভাবে মারতে পারে। এখন শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে গরিব মানুষের জমানো টাকার উপর। দেশকে লুট করার সুযোগ করে দিচ্ছে কর্পোরেট হাউসকে। রাজ্য সরকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। মানুষের রুটি-রুজির আন্দোলনকে দুর্বল করতে শুরু হয়েছে জাত-পাত, ধর্মের নামে বিভাজন। চলছে বিভেদের রাজনীতি। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে দাঙ্গার আঁচ লাগেনি মানুষের গায়ে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ভারতী ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন মণিমালা দাস, গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন অঞ্জলি মণ্ডল।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮৬৯ সালের ৫ মার্চ। ২. কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসু। ১৮৮৩ সালের ৫ মার্চ। ৩. ১৯১৮ সালের ৫ মার্চ। ৪. ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ, জন্ম ১৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর। ৫. ২০১৩ সালের ৫ মার্চ। ৬. ১৯১৫ সালের ৬ মার্চ, শান্তিনিকেতনে। ৭. সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার, জন্ম ১৯৩১ সালের ৭ মার্চ। ৮. ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ। ৯. ১৯১১ সালের ৮ মার্চ। ১০. ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ। ১১. ২০০৪ সালের ৮ মার্চ। ১২. ক্যাথলিন বিগেলো, ছবি 'দ্য হার্ট লকার' ৬টি অস্কার পায়।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক ও পাঠক অভিযোগ করছেন যে তাঁরা ডাকযোগে পত্রিকা পাচ্ছেন না। এমনও অভিযোগ আসছে কেউ কেউ তিন-চারটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। ডাক কর্মীবন্ধুদের প্রতি আমাদের অনুরোধ গ্রাহকরাই পত্রিকার চালিকা শক্তি। সময়মতো ও নিয়মিত তাঁদেরকে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। — *কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

শৈলবালা ঘোষজায়া এবং সুলেখা সান্যাল

—তিনের পাতার পর

মেয়েমানুষ থেকে মানুষে পরিণত করার এবং 'কপাল' বা ভাগ্যলিপি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন সুলেখা। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সের ফসল 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসে যেন সুলেখা সান্যালের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে।

মায়ের চেষ্টাতেই সুলেখার বাল্য ও কৈশোরের লেখাপড়া পুত্রকন্যাহীন মাসির কাছে চট্টগ্রামে। ১৯৪৪এ ম্যাট্রিকুলেশন কোড়কদির হাইস্কুল থেকে। এরপর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঠাকুরদার রক্তচক্ষু, পারিবারিক আভিজাত্যকে উপেক্ষা করে পরবর্তী ধাপে আই.এ পড়ার জন্য ভর্তি হন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে। ১৯৪৬-এ ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন সুলেখা। তারপর তাঁর কলকাতায় চলে আসা। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে তখনকার মতো গ্র্যাজুয়েট হওয়া হয়নি। যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন ১৯৫২ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চা এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন একই সঙ্গে। শিক্ষকতা করেছিলেন খিদিরপুর অ্যাকাডেমিতে। বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল পরিবার হিসেবে চলে আসা তাঁর মা-বাবা থাকতেন বর্ধমানের পীরপুকুর এলাকায়।

রাজনীতির সূত্রে দাদা অবন্তী সান্যালের বন্ধু তথা রাজনৈতিক সহকর্মী চিত্ত বিশ্বাসের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুলেখা সান্যালের এবং তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি। এক সময় বৌদ্ধিক সৃষ্টিশীলতার সূত্রে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ননী ভৌমিকের কাছাকাছি আসেন। ননী ভৌমিক ১৯৫৬-র শেষ দিকে 'প্রগতি প্রকাশন'-এ অনুবাদকের কাজে যোগ দিতে মস্কো চলে যান। সুলেখা সান্যাল চলে আসেন বর্ধমানে মায়ের কাছে। শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন বড়শুল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের বিদ্যালয়ে। ১৯৫৭-তে তাঁর লিউকোমিয়া ধরা পড়ে। ১৯৫৮-তে মস্কোর লেনিন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। সেখানেও তিনি মানসিক আঘাত পান ননী ভৌমিকের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়াতে। ফিরে আসেন ১৯৫৯-এ।

মৃত্যুচ্ছায়ার আবর্তে থেকেও জীবনকে ভালোবেসেছেন। ১৯৬১-এ বিটি ডিপ্লোমা এবং পরের বছর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্পেশাল অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক কারণে শেষ করতে পারেননি এমএ-র পাঠ। ১৯৬২-র ৪ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর জীবন পরিসর মাত্র ৩৪ বছর ৫ মাসের। তার মধ্যে ১৫-১৬ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি লিখেছিলেন 'নবাঙ্কুর' এবং 'দেওয়ালপদ্ম' উপন্যাস এবং চল্লিশটি গল্প। তাঁর অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক। তাঁর সময়ের গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনার তথাকথিত আভিজাত্য ছিল নারী প্রগতির অন্তরায়। এই ভাবনার বিরুদ্ধ প্রতিফলন ঘটেছিল সুলেখা সান্যালের জীবনচর্যায় এবং সাহিত্যকর্মে।

মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে স্মারকলিপি

—প্রথম পাতার পর

বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় বলেন, এর আগেই কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্ট তথা বিক্রি বন্ধ করার জন্য একাধিকবার যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় স্বীকার করেন যে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের যে প্রযুক্তি আছে তা ভারতে তো বটেই, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে তা বিরল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্ট প্রস্তাব খারিজের জন্য যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে 'নীতি আয়োগ'-এর সাথে আগামী এক মাসের মধ্যে আলোচনায় বসবার চেষ্টা করবেন ও অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিক্রি বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করবেন। এর আগে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিশেষ ইস্পাতের তৈরি একটি স্মারক মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র হাতে তুলে দেন যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, অনীত মল্লিক, শম্ভু প্রমাণিক সহ অন্যান্যরা। অপরদিকে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের স্ট্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্ট প্রস্তাব খারিজের জন্য হস্তক্ষেপ চেয়ে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীকে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি চিঠি দিয়েছেন দুর্গাপুর (পূর্ব)-এর সিপিআই(এম) বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়।

—প্রথম পাতার পর

বিশ্ব গ্লকোমা দিবস

গ্লকোমা রোগীর সংখ্যা সাত কোটির বেশি।

চিকিৎসকরা বলছেন আমাদের অনেকেই অসচেতনতার কারণে চিকিৎসকের কাছে যেতে দেরি করে ফেলি। ফলে চিকিৎসকের তখন কিছুই করার থাকে না। তাছাড়া চোখের কিছু সমস্যা দেখা দিলে নিজেরাই দোকান থেকে ঔষধ কিনে খাই এবং চোখে ড্রপ লাগিয়ে থাকি ফলে অবস্থাটা জটিল হয়ে যায়।

তাই চোখ সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই প্রতি বছর ১২ মার্চ দিবসটি বিশ্ব গ্লকোমা দিবস এবং ১১ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ এই সপ্তাহটি বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ হিসাবে পালনের আহ্বান জানানো হয়। এবছর এই দিবস ও সপ্তাহটি পালনের জন্য থাইল্যান্ড বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। আয়ারল্যান্ডেও নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এবছরে গ্লকোমা দিবসের থিম হলো 'সবুজের কাছে যাও'। আসুন আমরা দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে চোখের সচেতনতা গড়ে তুলি।

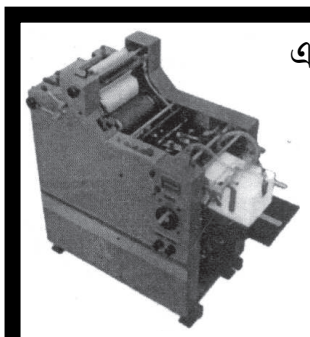
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
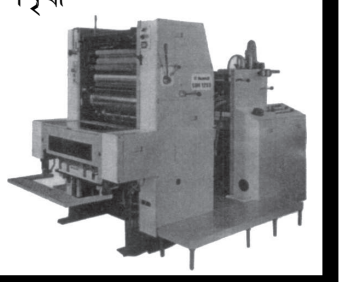
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা